بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১১ই ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, সম্প্রতি এখানকার এক পত্রিকার একজন কলামিস্ট লিখেছেন একইভাবে একজন অস্ট্রেলিয়ান রাজনীতিবিদও বলেছেন, ইসলামী শিক্ষায় জিহাদ এবং অপরাপর যত নির্দেশাবলী রয়েছে তার কারণেই মুসলমানরা উগ্রপন্থী হয়ে উঠছে। ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের একজন রাজনীতিবিদও এই কথাই বলেছেন, ইসলামী শিক্ষায় অবশ্যই কিছু কিছু উগ্র বা চরমভাবাপন্ন শিক্ষা রয়েছে যে কারণে মুসলমানরা আজ উগ্র মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। আজকাল ইসলামের নামে ইরাক এবং সিরিয়ায় যেই উগ্রপন্থী গোষ্ঠী কিছু অঞ্চল দখল করে নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে তারা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সরকারকে কেবল যে হুমকি-ধমকীই দিয়েছে তা-ই নয় বরং কোন কোন স্থানে পাশবিক এবং নৃশংস আক্রমন চালিয়ে প্রাণহানিও ঘটিয়েছে, যার কথা আমি গত খুতবায় উল্লেখ করেছি। এ বিষয়টি যেখানে সাধারণ মানুষকে ভীত-ত্রস্ত করে তুলেছে সেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কতক নেত্রীবৃন্দকে তাদের অজ্ঞতা বা ইসলাম বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইসলাম সম্পর্কে মুখ খোলার সুযোগ করে দিয়েছে। বক্তারা এবং লেখকরা একথা বলে এবং লিখে যে, নিঃসন্দেহে অন্যান্য ধর্মের শিক্ষায়ও কিছু কঠোর আদেশ-নিষেধ থেকে থাকবে কিন্তু সেসব ধর্মের মান্যকারীরা হয়তো তা অনুসরণ করে না বা পরিস্থিতি অনুসারে তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটিয়েছে আর যুগের চাহিদা অনুসারে শিক্ষায় পরিবর্তন এনেছে। তারা এ কথার ওপর জোর দিচ্ছে যে, কুরআনের শিক্ষায়ও যুগের চাহিদা অনুসারে পরিবর্তন আনা উচিত। যাহোক এতে অন্ততঃপক্ষে একথাটি প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের কথা অনুসারে এদের শিক্ষা আর খোদার শিক্ষা রইল না বরং তা মানুষেরই মনগড়া শিক্ষা। আর এমনই হওয়ার ছিল কেননা; এসব শিক্ষা স্থায়ী হওয়ার বা কিয়ামত পর্যন্ত এগুলোর অনুসরণকারী জন্ম নেয়া সংক্রান্ত খোদা তা'লার কোন প্রতিশ্রুতি নেই, কিন্তু কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অর্থাৎ, এই যিক্‌র বা এই কুরআনকে আমরাই নাযিল করেছি আর আমরাই এর সুরক্ষা করবো (সূরা আল্ হিজর-১০) সেখানে তিনি এর সুরক্ষা বা হিফাযতের ব্যবস্থাও হাতে নিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন সময় তাঁর বিভিন্ন পুস্তকে এই আয়াতের তফসীর করেছেন।

এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, **এটিই আল্লাহ্ তা'লার চিরন্তন রীতি যে, তিনি যখন কোন জাতিকে কোন কাজ করতে বারণ করেন তখন তাদের কতকের সেই অপকর্মে লিপ্ত হওয়া একটি অবধারিত নিয়তি। যেভাবে তওরাতে তিনি ইহুদীদের বারণ করেছিলেন যে তোমরা তওরাত এবং অন্যান্য ঐশী গ্রন্থে পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা প্রক্ষেপণ করবে না। কিন্তু তাদের কতক তাতে প্রক্ষেপণ করেছে। কিন্তু কুরআনে কোথাও একথা বলা হয়নি যে, তোমরা**

কুরআনে প্রক্ষেপণ করবে না বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করবে না বরং বলা হয়েছে, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

এরপর তিনি (আ.) বলেন, **"এই আয়াত স্পষ্টভাবে বলছে, এই শিক্ষাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার মানসে যখন এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটবে তখন খোদা তা'লা ঊর্ধ্বলোক থেকে তাঁর কোন প্রেরিতের মাধ্যমে এর সুরক্ষা বিধান করবেন।"** অতএব বিভিন্ন সময় কুরআনী শিক্ষার ওপর আপত্তি করে এরা এর শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় কেননা; তাদের নিজেদের শিক্ষা হয়তো বিলুপ্ত গেছে বা শুধু গ্রন্থের মাঝেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। আজকাল তথ্য আদান-প্রদানের বিভিন্ন রীতি রয়েছে যেমন, টুইট করা হয় বা হোয়াট্স এ্যাপ ইত্যাদি করা হয়। সম্প্রতি হোয়াট্স এ্যাপ ইত্যাদিতে একটি স্বল্প-দৈর্ঘ্য প্রামান্য চিত্র আদান-প্রদান হচ্ছে। তাতে দেখা যায়, দু'জন যুবক একটি বই থেকে মানুষকে কিছু আয়াত বা আয়াতের অংশ পাঠ করে শোনাচ্ছে যার মলাটে লেখা ছিল কুরআন। তারা বিভিন্ন মানুষকে জিজ্ঞাসা করছিল এবং তাদের মতামত জানতে চাচ্ছিল যে, এগুলো কেমন শিক্ষা? এর মলাটে যেহেতু কুরআন বা কুরআন সংক্রান্ত বই লেখা ছিল, তাদের সবাই শুধু একারণে ইসলামী শিক্ষার সমালোচনা করছিল এই বলে যে, দেখ! প্রমাণ হয়ে গেছে, ইসলামী শিক্ষাই এমন, যে কারণে মুসলমানরা এমন অপকর্ম করে বেড়ায়। এর কিছুক্ষণ পরে সেই যুবকরা সেই গ্রন্থের মলাট খুলে ফেলে এবং দেখায় যে, এটি ইসলাম নয় বরং বাইবেলের শিক্ষা, তারা বলে যে আমরা আসলে বাইবেল পড়ছিলাম। কিন্তু কেউ তখন আর কোন নেতিবাচক মন্তব্য করেনি। ইসলামের নাম শুনলে তাৎক্ষণিকভাবে সমালোচনামূখর হয়ে মন্তব্য আরম্ভ হয়ে যায়, কিন্তু তখন তারা হেসে চুপ হয়ে যায়। পুরুষ মহিলা সবাই মন্তব্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একজন মহিলা অবাক হয়ে বলে, আশ্চর্যের বিষয়, আমি তো খ্রিস্টান স্কুলে পড়ালেখা করেছি, বাইবেলও পড়েছি। আমার এদিকে দৃষ্টিই যায় নি। এই হলো এদের স্বরূপ। কোন মুসলমান যদি অপকর্ম করে সেটিকে তারা ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করে কিন্তু যদি অন্য ধর্মের কেউ এমন করে তাহলে তারা বলে, এই বেচারা অক্ষম বা পাগল। আমরা মানি এবং জানি, ইসলাম সম্পর্কে কতিপয় মুসলমান গোষ্ঠীর ভ্রান্ত আচরণ এই ধর্মকে দুর্নাম করে রেখেছে কিন্তু এর জন্য কুরআনী শিক্ষাকে আক্রমনের লক্ষ্যে পরিণত করা আর এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের হৃদয়ের হিংসা এবং বিদ্বেষেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এর এক চরম বহিঃপ্রকাশ হলো আজকাল আমেরিকার একজন প্রেসিডেন্ট পদ-প্রার্থীর ইসলাম এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা।

যাহোক ইসলাম সম্পর্কে এরা যা ইচ্ছা বলতে পারে। কিন্তু ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার মোকাবিলা কোন ধর্মীয় শিক্ষাও করতে পারবে না আর তাদের নিজেদের প্রণীত কোন আইনও নয়। পরিস্থিতি অনুসারে তাদের ধর্মীয় পুস্তকে পরিবর্তন আনলেও পারবে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এ যুগেও স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে কুরআনের সুরক্ষার জন্য তাঁর এক মনোনীত মহাপুরুষকে পাঠিয়েছেন। যিনি ইসলামের দৃষ্টিনন্দন শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, **"পবিত্র কুরআন, যার অপর নাম হলো যিক্‌র বা উপদেশবাণী, তা সেই প্রারম্ভিক যুগে মানুষের মাঝে প্রচ্ছন্ন ও বিস্মৃত সত্য এবং আভ্যন্তরীণ শক্তি ও যোগ্যতার কথা স্মরণ করানোর জন্য এসেছিল। খোদার সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি** إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (সূরা আল্ হিজর-১০) **অনুসারে এ যুগেও ঊর্ধ্বলোক থেকে একজন শিক্ষক এসেছেন যিনি** وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ (সূরা আল্ জুমু'আ-৪) **এর সত্যায়নকারী এবং প্রতিশ্রুত ব্যক্তি। তিনিই সে ব্যক্তি, যিনি এখন তোমাদের মাঝে কথা বলছেন।"**

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, **"আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং** إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ **এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে কুরআন এবং ইসলামের সুরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং মুসলমানদের এই পরীক্ষা এবং নৈরাজ্যের মাঝে হাবুডুবু খাওয়া হতে রক্ষা করেছেন। তাই সৌভাগ্যবান তারা যারা এই জামাতকে মূল্যায়ন করে এবং এর থেকে উপকৃত হয় অর্থাৎ তাঁর জামাতভুক্ত হয়।"**

তিনি (আ.) আরো বলেন, **"আল্লাহ্ তা'লা আপন প্রতিশ্রুতি অনুসারে কুরআনের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আমাকে পাঠিয়েছেন। কুরআনের সাহায্য এবং সমর্থন আমাদের সাথে রয়েছে। এটি আজ অন্য কোন ধর্ম বা ধর্মের অনুসারীদের ভাগ্যে জোটেনি।"**

অতএব এ বিষয়গুলো ইসলাম বিরোধীদের আপত্তির যথেষ্ট উত্তর। তাদের এই কথা বলা যে, অন্যান্য ধর্ম যুগের দাবি অনুসারে নিজের মাঝে বা নিজের রূপে পরিবর্তন করেছে এটি এ কথার স্বীকারোক্তি যে, সেসব ধর্ম প্রাণহীন। কিন্তু একইসাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই প্রতাপান্বিত বাণীতে মুসলমানদেরও আহ্বান করা হচ্ছে যে প্রচার মাধ্যম এবং বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামের ওপর যে আক্রমন হচ্ছে তা খন্ডনের জন্য সেই ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক বন্ধন রচনা করে ইসলামের দৃষ্টিনন্দন শিক্ষার মাহাত্ম্য তুলে ধরার মাধ্যমে এসব বিরোধীর মুখ বন্ধ করুন যারা ইসলামের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস এবং উগ্রতার অপবাদ আরোপ করে থাকে। যারা বা যেই গোষ্ঠী তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারের দাবি করে তারা সত্যিকার অর্থে ইসলাম বিরোধী শক্তির হাতের ক্রীড়নক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের স্পষ্টভাবে অবহিত করেছেন, **এ যুগ তরবারির জিহাদের যুগ নয়**। আর তরবারির জিহাদের অনুমতি বিশেষ পরিস্থিতিতে দেয়া হয়েছিল যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে সৃষ্টি হয়েছিল; অর্থাৎ শত্রুরা ইসলামকে তরবারির জোরে নিশ্চিহ্ন করার স্বপ্ন দেখছিল। ইসলাম শান্তি এবং প্রেম-প্রীতির শিক্ষায় পরিপূর্ণ অর্থাৎ পবিত্র কুরআন এই শিক্ষায় পরিপূর্ণ।

অতএব বর্তমান যুগে এই শিক্ষা প্রচার করার প্রয়োজন রয়েছে। আর প্রত্যেক আহমদীর এই শিক্ষা অনুধাবন করা প্রয়োজন রয়েছে, ব্যবহারিক জীবনে এটি মেনে চলার প্রয়োজন রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার প্রয়োজন রয়েছে। কেবল তবেই আমরা আহমদী হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হব। আজ কেবল আমরা আহমদীরাই মুসলমান এবং অমুসলমান উভয় শ্রেণীকে এই সত্য সম্পর্কে অবহিত করতে পারি। যারা

ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তি করে তারা অজ্ঞ। আর তাদেরকে তাদের অজ্ঞতা সম্পর্কে আমাদের-ই অবহিত করতে হবে। ইসলামী শিক্ষা, শান্তি এবং নিরাপত্তার শিক্ষা। কুরআনী শিক্ষার আলোকেই এই শিক্ষা পৃথিবীবাসীকে দেখাতে হবে। তাদেরকে বলতে হবে, তোমরা না জেনেই যে বলে বস, ইসলামী শিক্ষায় উগ্রতা রয়েছে, এ কারণে মুসলমানরা উগ্রপন্থী হয়ে উঠেছে– এটি তোমাদের জ্ঞানহীনতা এবং অজ্ঞতার পরিচয়। মুসলমানদেরও বলতে হবে, পারস্পরিক হত্যা, খুন এবং দলাদলির মাধ্যমে তোমরা ইসলামের দুর্নাম করছ। যদিও আমাদের কাছে খুব বেশি রিসোর্সেস বা উপায়-উপকরণ নেই তথাপি যতটা আমরা প্রেস বা প্রচার মাধ্যম ইত্যাদির মাধ্যমে কাজ করতে পারি তা সব দেশে এবং সব শহরে আমাদের করতে হবে। এখন পৃথিবীর মানুষকে ইসলামের সঠিক চিত্র দেখানো একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রায় সর্বত্রই এদিকে জামাতের দৃষ্টি রয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতির দাবি হলো, অনবরত এ সম্পর্কে প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করা, তাদের সাথে সুসম্পর্ক এবং নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা। তাদের মাধ্যমে জনসাধারণকে এ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় আমেরিকায় জামাতের ব্যাপক যোগাযোগ রয়েছে। অন্যান্য দেশেও রয়েছে। এখানেও কিছু যোগাযোগ আছে এবং জার্মানীতেও রয়েছে। এখন যোগাযোগের এই পরিধিকে আরো ব্যাপকতর করা প্রয়োজন ।

সম্প্রতি এখানে ব্রিটিশ সংসদে গ্লাসগোর একজন এমপি ইসলামের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে আহমদীয়া জামাতের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'ইসলামের শান্তি এবং নিরাপত্তাপূর্ণ শিক্ষা যারা মেনে চলে তারা হলো, আহমদী মুসলমান। আমি গ্লাসগোতে তাদের একটি শান্তি সম্মেলনে অর্থাৎ পিস সিম্পোজিয়ামে যোগ দিয়েছিলাম; তিনি এর ভূয়সী প্রশংসা করেন।' তখনই সেখানে উপস্থিত বৃটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা হোম সেক্রেটারী বলেন, 'আহমদীরা যে ইসলাম তুলে ধরে তা সত্যিই সেই শিক্ষা থেকে পৃথক যা উগ্রপন্থী মুসলমানরা তুলে ধরে। আর সত্যিকার অর্থে আহমদীরা শান্তিপ্রিয় নাগরিক। **সত্য কথা হলো, আহমদীরা নতুন কোন শিক্ষা তুলে ধরে না বরং কুরআনী শিক্ষাই উপস্থাপন করে।**' কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ঘটনার পর আমরা যদি নীরব হয়ে যাই তাহলে কিছুদিন পর মানুষ ভুলে যাবে যে, হ্যাঁ বৃটিশ সংসদে একটি প্রশ্ন উঠেছিল আর এটিই সবকিছু! এটিকে এখন সবসময় স্মৃতিপটে জাগ্রত রাখতে হবে যে, ইসলামী শিক্ষা কী। একবার প্রচার মাধ্যম হয়তো সংবাদ প্রকাশ করে এরপর তারা নীরব হয়ে যায়। কিন্তু উগ্রতামূলক কোন ঘটনা যদি ঘটে বা না ঘটলেও এর বরাতে পত্রিকায় লাগাতার শিরোনাম ছাপা হয় আর তখনই ইসলাম বিরোধীরা ইসলামের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সুযোগ পায়।

সম্প্রতি আমার জাপান সফরকালে সেখানেও শিক্ষিত শ্রেণী একথারই বহিঃপ্রকাশ করছিল বরং একজন খ্রিস্টান পাদ্রীও বলেন, **এই ইসলামী শিক্ষা যা আপনি কুরআনী শিক্ষার আলোকে তুলে ধরছেন, জাপানীদের এ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার খুবই প্রয়োজন রয়েছে বরং পৃথিবীবাসীর এর প্রয়োজন রয়েছে।** তিনি বলেন, **এটি তখনই কল্যাণকর হবে যদি এই কথাকে এই অনুষ্ঠান পর্যন্তই সীমিত না রাখা হয় যাতে আপনি বক্তৃতা করছেন বরং এই শিক্ষা সম্পর্কে**

মানুষকে অবহিত করার অব্যাহত চেষ্টা করুন। অতএব ন্যায়পরায়ণ অ-মুসলমানরাও বলছেন যে, গুটিয়ে বসে থাকবেন না বরং অবিরত পৃথিবীবাসীর সামনে এই শিক্ষা যদি তুলে ধরেন বা তুলে ধরা অব্যাহত রাখেন তবেই লাভজনক হবে। এখন জাপান জামাতের কাজ হবে, সঠিক পরিকল্পনা করে এই কথাকে স্মৃতিপটে জাগরুক রাখা। ইসলামের দৃষ্টিনন্দন শিক্ষার জ্ঞান এবং বুৎপত্তি যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আমাদের লাভ হয়েছে একে যুক্তরাজ্য এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রচার এবং প্রসার করুন। এই সুন্দর শিক্ষার সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারে না। আর এসব কথা কুরআনী শিক্ষার আলোকে তিনি (আ.) আমাদের অবহিত করেছেন। জামাতের বই-পুস্তক এবং সাহিত্যেও তা বিভিন্ন জায়গায় লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের সঠিক তফসীর এবং ব্যাখ্যা করার জন্য বা তফসীর ও ব্যাখ্যা প্রচার এবং প্রসারের জন্য, এর সঠিক অর্থ প্রচার এবং প্রসারের জন্য এবং কুরআনের সুরক্ষা ও হিফাযতের জন্য তাঁকে (আ.) পাঠিয়েছেন— যেমনটি কিনা তিনি নিজেই বলেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর রচনাবলী, তাঁর মলফুযাত ও বক্তৃতার মাধ্যমে যথাযথভাবে এই দায়িত্ব পালন করেছেন।

সুতরাং এ যুগে কুরআনের হিফাযত ও সুরক্ষার কাজ আল্লাহ্ তা'লা তাঁর হাতে সাধন করেছেন আর প্রত্যেক আহমদীর এখন দায়িত্ব হলো, সব শ্রেণী এবং সব প্রকৃতির মানুষের কাছে এই বাণী পৌঁছানো। সর্বত্র এই বাণী পৌঁছানোর মাধ্যমে তাঁর হাতে বয়আতের সুবাদে যে দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায় তা পালন করুন। এখন আমি কিছু দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরবো যা ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য প্রকাশ করে। পবিত্র কুরআনের এক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ অর্থাৎ, ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। (সূরা আল্ বাকারা-২৫৭)

এরপর বলেন, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ অর্থাৎ, যদি আল্লাহ্ তা'লা নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চাইতেন তাহলে ভূপৃষ্ঠে যত মানুষ আছে সবাই ঈমান আনতো। (সূরা ইউনুস-১০০)

অতএব যেখানে আল্লাহ্ তা'লাও বাধ্য করেন না সেখানে তুমি কি মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করবে? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, **"ইসলাম কখনো জোর-জবরদস্তির শিক্ষা দেয়নি। মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যদি আল্লাহ্ তা'লা চাইতেন তাহলে لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا পৃথিবীতে যারাই আছে তাদের সবাই ঈমান নিয়ে আসতো কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তা চাননি। তাই মহানবী (সা.)-এর বাসনা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা বলেন , এই কাজ তুমি চাইলেই হবে না।"** অতএব একথা সব সময় দৃষ্টিগোচর রাখা চাই আর এই একটিমাত্র শিক্ষাই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে, ইসলামে কোনরূপ জোর জবরদস্তির সুযোগ নেই। তিনি বলেন, ইসলাম কখনো বলপ্রয়োগের শিক্ষা দেয়নি। যদি কুরআন এবং সমস্ত হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করা হয় আর মানুষ যদি যথাসাধ্য প্রণিধানের সাথে পড়ে ও শুনে এবং বোঝার চেষ্টা করে তাহলে ইসলাম তরবারির মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের শিক্ষা দেয় মর্মে আপত্তিটি অত্যন্ত লজ্জাস্কর এবং ভিত্তিহীন একটি আপত্তি প্রমাণিত হবে

দিয়েছে। এটি তাদের ধারণা মাত্র যারা বিদ্বেষমুক্ত হয়ে কুরআন, হাদীস এবং ইসলামের নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি বরং মিথ্যা এবং অপবাদ আরোপের ওপরই পুরোপুরি নির্ভর করেছে। কিন্তু আমি জানি, সেই যুগ ঘনিয়ে আসছে যখন সততার সন্ধানী ও ভিখারীদের সামনে এভাবে অপবাদ আরোপের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমরা কি সেই ধর্মকে জোর-জবরদস্তিমূলক ধর্ম আখ্যা দিতে পারি যার ঐশীগ্রন্থ কুরআনে স্পষ্ট শিক্ষা রয়েছে যে, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ । অর্থাৎ, জোর করে কাউকে ধর্ম গ্রহণের বাধ্য করা যাবে না, ধর্মের বিষয়ে জোর-জবরদস্তি বৈধ নয়। আমরা সেই সম্মানিত রসূলকে জোর-জবরদস্তির জন্য অভিযুক্ত করতে পারি কি যিনি তের বছর পর্যন্ত দিবারাত্র মক্কায় নিজের অনুসারীদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, অনিষ্টের মোকাবিলা করবে না, ধৈর্য ধারণ কর? অবশ্য শত্রুর দুস্কৃতি যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং ইসলাম ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সব জাতি যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে তখন ঐশী আত্মাভিমানের দাবি ছিল যারা তরবারি হাতে নেয় তাদেরকে তরবারির মাধ্যমেই হত্যা করা। নতুবা পবিত্র কুরআনে কোথাও বলপ্রয়োগের শিক্ষা দেয়া হয়নি। যদি জোর জবরদস্তির শিক্ষা দেয়া হতো তাহলে আমাদের রসূল (সা.)-এর সাহাবীগণ জোর-জবরদস্তি মূলক শিক্ষার কারণে পরীক্ষার সময় প্রকৃত বিশ্বাসীদের মতো নিষ্ঠা প্রদর্শন করতে সক্ষম হতেন না। জোর-জবরদস্তি বা বাহুবল যদি প্রয়োগ করা হয় তাহলে তারা কখনো আন্তরিকতার সাথে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, **"আমাদের নেতা ও মনিব, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের বিশ্বস্ততা এমন একটি বিষয় যা এখানে বিষদভাবে তুলে ধরার আমাদের প্রয়োজন নেই।"**

তিনি (আ.) আরো বলেন, **তিন প্রকার যুদ্ধের বাইরে কোন ইসলামী যুদ্ধ ছিল না। ইসলামে তিন ধরনের যুদ্ধ ছিল অর্থাৎ তিনটি ক্ষেত্রে কঠোরতা প্রদর্শনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ প্রতিরক্ষামূলক বা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ অর্থাৎ কেউ আক্রমন করলে তখন হাতে অস্ত্র তুলে নেয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ শাস্তিস্বরূপ, অর্থাৎ হত্যার অপরাধে হত্যা অর্থাৎ, কেউ হত্যা করলে তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য। অর্থাৎ কেউ আক্রমন করেছে, রক্ত ঝরিয়েছে তখন শাস্তি স্বরূপ অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বা শাস্তি দেয়া হয়েছে বা হত্যা করা হয়েছে; যুদ্ধ হোক বা শান্তির যুগ হোক উভয় ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। আর তৃতীয়তঃ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থাৎ আক্রমনকারীদের শক্তিকে পদদলিত করার জন্য। যারা মুসলমান হওয়ার দোষে হত্যা করতো, এমন শত্রু যারা শুধু এ কারণে হত্যা করতো যে, তোমরা মুসলমান কেন হলে? মুসলমান হওয়ার কারণে হত্যা করা এটি একটি ধর্মীয় হত্যাকান্ড, অর্থাৎ, ধর্ম পরিবর্তন করেছ বলে তোমাকে হত্যা করা হচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এরা মুসলমানদের হত্যা করছে, তাই এদের বিরুদ্ধেও তরবারি হাতে নেয়া বৈধ।** তিনি বলেন, **এই তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোন কারণে তরবারি হাতে তুলে নেয়ার বা কঠোর ব্যবহারের অনুমতি নেই।**

তিনি (আ.) বলেন, কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, ধর্ম প্রচারের জন্য তরবারি হাতে তুলে নেবে না। ধর্মের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যাবলী তুলে ধর আর উত্তম আদর্শের মাধ্যমে মানুষকে

নিজের দিকে আকৃষ্ট কর। এ কথা মনে করো না যে, সূচনাতে বা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে তরবারি হাতে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে! সেই তরবারি ধর্ম প্রচারের জন্য হাতে তুলে নেয়া হয়নি বরং শত্রুর আক্রমন থেকে আত্মরক্ষার জন্য বা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল। ধর্মের জন্য বলপ্রয়োগ এর উদ্দেশ্য ছিল না।

তিনি (আ.) বলেন, **যারা মুসলমান আখ্যায়িত হয়ে শুধু এতটুকুই জানে যে, তরবারির মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করা উচিত; তারা ইসলামের অভ্যন্তরিন সৌন্দর্যকে স্বীকার করে না। আর তাদের বা এদের কার্যক্রম পশুর কাজের সাথে সামঞ্জস্য রাখে অর্থাৎ এরা পশু।** অতএব জোর করে ইসলামভুক্ত না করার ঘোষণা আপত্তিকারীর আপত্তি খন্ডনের জন্য যথেষ্ট। যারা বিবেকবান এবং বুদ্ধিমান তারা জানে এবং বুঝে যে অনর্থক এবং অন্যায়ভাবে ইসলামের দুর্নাম করা হয়। যেমনটি আমি বলেছি, অনেক শিক্ষিত মানুষ এমনকি খ্রিস্টান পাদ্রীও অনুরোধ করেছেন যে, ইসলামের এই শান্তিপ্রিয় এবং শান্তিপূর্ণ শিক্ষার অনেক বেশি প্রচার কর । মানুষ যে বলে, ইসলামী শিক্ষা প্রচার কর— এর মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উক্তি‘ সততার সন্ধানী এবং ভিখারীরা এসব অপবাদ সম্পর্কে অবহিত হবে, যখন তারা জানতে পারবে যে, মূল শিক্ষা কী’— পূর্ণতা লাভ করছে। কিন্তু একই সাথে তিনি (আ.) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে ধর্মের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যকে তুলে ধর। আর আর এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকলেই এটি সম্ভব হতে পারে; অতএব জ্ঞান বৃদ্ধি কর। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন, উত্তম আদর্শের মাধ্যমে তাদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট কর, উত্তম আদর্শ প্রদর্শন কর যেন তোমাদের দেখেই মানুষ ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়।

তাই সব আহমদীর অনেক বড় দায়িত্ব হলো, ধর্মের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য তুলে ধরার জন্য কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, এরপর ব্যক্তিগত উত্তম আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা। আর এই জ্ঞান এবং কর্মগুণেই এযুগে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাসত্বের শৃঙ্খলে এসে কুরআন এবং ইসলামের সুরক্ষা বা হিফাযতের কাজে আমরা অবদান রাখতে পারি আর পৃথিবীবাসীকে বলতে পারি, যদি পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে কুরআনের মাধ্যমেই তা সম্ভব।

ইসলাম যারা গ্রহণ করে না, তাদের চিত্র এক জায়গায় পবিত্র কুরআন এভাবে অঙ্কন করেছে, وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا অর্থাৎ, তারা বলে, তোমার প্রতি যে হিদায়াত অবতীর্ণ হয়েছে আমরা যদি তার অনুসরণ করি তাহলে আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে (সূরা আল্ কাসাস-৫৮)। তাই ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি এই কারণে করা হয় না যে, এটি অন্যায় এবং জোর-জবরদস্তির শিক্ষা দেয় বরং যারা গ্রহণ করে না তারা যে আপত্তি করছে এর কারণ হলো তারা বলে, তোমার শিক্ষা যা শান্তির শিক্ষা, যা নিরাপত্তার শিক্ষা, তা অনুসরণ করলে চতুষ্পার্শ্বের বিভিন্ন জাতি আমাদের ধ্বংস করে দেবে। অতএব ইসলামী শিক্ষা বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করার শিক্ষা, শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার শিক্ষা, প্রেম এবং ভালোবাসার বাণী প্রচার এবং প্রসারের শিক্ষা। কতিপয় মুসলমান দল যদি এই শিক্ষা না মানে

এটি তাদের দুর্ভাগ্য। কুরআন নিঃসন্দেহে মূলরূপে তাদের কাছে সংরক্ষিত আছে কিন্তু এর ওপর তাদের কোন আমল নেই, তারা এটি মেনে চলে না। কুরআন এবং কুরআনী শিক্ষার যেভাবে হিফাযত বা সুরক্ষা করা উচিত সেই হিফাযতের দায়িত্ব তারা পালন করছে না। এর সুরক্ষার দায়িত্ব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামাতকেই পালন করতে হবে। জ্ঞান এবং কর্মের মাধ্যমে আমাদেরই পৃথিবীবাসীকে অবহিত করতে হবে, পৃথিবীর শান্তি এবং নিরাপত্তা ইসলামের পক্ষ থেকে হুমকির সম্মুখীন নয় বরং তাদের পক্ষ থেকে হুমকির সম্মুখীন যারা এর বিরুদ্ধে চলছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে উদ্ধৃতি আমি পড়েছি তাতে তিনি বলেন, এরা যে ইসলামকে দুর্নাম করে এরা আসলে তারা মিথ্যা এবং অপবাদ আরোপ করছে। সত্যিকার অর্থে তাদের এই মিথ্যা ও অপবাদ আরোপ পৃথিবীর শান্তি এবং নিরাপত্তাকে হুমকিগ্রস্ত করছে। এরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, পৃথিবীতে ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। মুসলমান দেশে যেসব নৈরাজ্য বিরাজ করছে সেখানেও কিছু পরাশক্তির হাত রয়েছে। এখন পাশ্চাত্যের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে তাদের আপনজনরাই বলছে, মুসলমান দেশের এই উগ্রপন্থী দলগুলো আমাদের সরকারেরই সৃষ্ট যা আমরা ইরাক যুদ্ধের পর বা সিরিয়ার পরিস্থিতির পর সৃষ্টি করেছি বা জন্ম দিয়েছি। এই কথা বলে আমি মুসলমান এবং যারা মুসলমান আখ্যায়িত হয়ে উগ্রতা এবং ইসলামী শিক্ষার ভ্রান্ত চিত্র তুলে ধরছে তাদেরকে দায়মুক্ত আখ্যাতিয়ত করছি না কিন্তু এই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার ক্ষেত্রে পরাশক্তিগুলোর অবশ্যই হাত রয়েছে। এ সবকিছুর বড় কারণ হলো সুবিচার না করা। এখন আর সেই যুগ নেই যে, কোন পরাশক্তি কোন বিবৃতি দিলেই পুরো পৃথিবী তা মাথা পেতে নিবে। বরং প্রচার মাধ্যমের সুবাদে সকল বিশ্লেষকের সেখানে পৌঁছা বা নিজের মতামত তুলে ধরা সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে। এখনও এক দিকে উগ্রপন্থীদের নিশ্চিহ্ন করার বুলি আওড়ানো হয়, তাদের ওপর বোমা বর্ষণ করা হয় আর অপর দিকে তাদের অস্ত্র সরবরাহকারী এবং অন্যায়ভাবে অর্থ সরবরাহকারী বা আর্থিক লেনদেন-কারীরদের জানা সত্ত্বেও অর্থাৎ, যদিও তারা জানে এ সবকিছু কীভাবে হচ্ছে তথাপি তারা চোখ বন্ধ করে রেখেছে।

অতএব পৃথিবীর শান্তি এবং নিরাপত্তাকে কেবল মুসলমান দলগুলোই হুমকিগ্রস্ত করছে না বরং যারা ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে গিয়ে অন্যায় অবিচার করছে বরং পৃথিবীর বড় বড় সরকারগুলোও রয়েছে, যারা নিজেদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় এবং পৃথিবীর শান্তি তাদের কাছে একটি কথার কথা বা গৌণ বিষয় মাত্র। একজন সত্যিকার মুসলমান জানে, আল্লাহ্ তা'লা হলেন, সালাম বা শান্তি। আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টির জন্য শান্তি এবং নিরাপত্তাই চান। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে শান্তি প্রদান এবং পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে কতই না শিক্ষা দিয়েছেন, আর কত প্রকার পথের দিশা দিয়েছেন বা দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন; মুসলমানদের মাঝে আজ সত্যিকার অর্থে কেবল আহমদীরাই একথার জ্ঞান এবং বুৎপত্তি রাখে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের এক জায়গায় বলেন, وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ অর্থাৎ, আর সে যখন বললো, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এরা ঈমান আনছে না, আল্লাহ্

তা'লা বলেন, তাদের উপেক্ষা কর আর এতটা বল যে, সালাম, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, এরা অচিরেই জানতে পারবে, এরা অচিরেই ইসলামের সত্য এবং বাস্তবতা অনুভব। (সূরা আয্ যুখরুফ-৮৯,৯০)

অতএব এহলো কুরআনী শিক্ষা। মহানবী (সা.) যখন আল্লাহ্ তা'লার দিকে ডাকেন তখন শ্রোতারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। মহানবী (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! আমি এদেরকে শান্তি এবং নিরাপত্তার দিকে ডাকি আর এরা অস্বীকার করছে। এরা শুধু অস্বীকারই করছে না বরং এরা এমন জাতি যারা শুধু ঈমান না এনেই ক্ষ্যান্ত দিচ্ছে না, শান্তির বাণীকে শুধু অবজ্ঞাই করছে না বরং তারা আমাকেও নিরাপদে থাকতে দেয় না এবং মুসলমানদের শান্তিকে বিনষ্ট করছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, فَاصْفَحْ عَنْهُمْ তুমি তাদের উপেক্ষা কর, তারা জানে না বা এরা নির্বোধ তাই বুঝে না, এরা রেগে যায়, ক্রোধান্বিত হয়। তাদের কথা শুনে এটিই বল, আমি তোমাদের জন্য শান্তি নিয়ে এসেছি, আমার কাজ হলো, শান্তির বার্তা প্রচার আর এই বাণীই আমি প্রচার করে যাব।

অতএব, মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এই নির্দেশই দিয়েছেন যে বিরোধীদের সকল সীমালঙ্ঘন দেখে এবং সহ্য করে কেবল এই উত্তরই দেবে, আমি তোমাদের শান্তির বার্তাই দিয়ে থাকি এবং দিয়ে যাব, যেন পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্যও যদি নির্দেশ এটিই হয়ে থাকে তাহলে মুসলমানের জন্য এটি কত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। আজকের পরিস্থিতিতে এভাবেই পয়গাম পৌঁছানো আমাদের দায়িত্ব। আমাদের কাজ হলো, শান্তি এবং নিরাপত্তার বাণী প্রচার করা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন, যদি ইসলামের পক্ষ থেকে কোন সময় তরবারি উঠানো হয়ে থাকে তবে তা-ও আত্মরক্ষামূলকভাবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, যুলুম এবং অন্যায় করার জন্য নয়। তাই প্রশ্নই উঠে না যে, কুরআন করীম কোন সময় বা কোন স্থানে এই নির্দেশ দিয়ে থাকবে যে তোমাদের কথা যে মানবে না তার বিরুদ্ধে তোমরা তরবারি হাতে তুলে নাও, তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেল। যদি কোন মুসলমান গোষ্ঠী এবং মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধান আপন কর্মে এর পরিপন্থী কোন আচরণ করে আর দাবি করে, আমরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করছি তার জানা উচিত, এটি সত্যিকার ইসলাম নয়, এগুলো এমন মানুষের ব্যক্তিস্বার্থ যা সে চরিতার্থ করতে চাচ্ছে বা পরাশক্তিগুলোর নিজস্ব স্বার্থ যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুসলমানদের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। আবার তাদের ওপর অপবাদ আরোপ করে যে, ইসলামী শিক্ষাই এমন। একজন প্রকৃত মুসলমান এবং রহমান খোদার বান্দার যে পরিচয় আল্লাহ্ তা'লা বর্ণনা করেছেন তাহলো, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا অর্থাৎ, যখন অজ্ঞরা তাদের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় তারা বিবাদ-বিষম্বাদ না করে বলে, আমরা তোমাদের জন্য শান্তিরই দোয়া করি। (সূরা আল্ ফুর্কান-৬৪)

অতএব এহলো কুরআনী শিক্ষা, আর এ শিক্ষাই সর্বস্তরে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং এ উদ্দেশ্যে চেষ্টা করার শিক্ষা দিয়ে থাকে। অতএব আমাদের সবাইকে বিশেষ করে যুব

সমাজকে কোন প্রকার হীনমন্যতার স্বীকার হওয়ার প্রয়োজন নেই কেননা; ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই পৃথিবীতে শান্তি এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে আর এটি কুরআন এবং কেবল কুরআনই যা শান্তি এবং নিরাপত্তার বিস্তার এবং উগ্রতার অবসানের শিক্ষা দিয়ে থাকে।

তাই এই শিক্ষার ব্যুৎপত্তি এবং জ্ঞানার্জন সবার জন্য আবশ্যক, এই শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে শিরোধার্য করা প্রয়োজন। এই শিক্ষা অনুসরণ করুন। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে জগদ্বাসীকে অবহিত করুন, আজকে কুরআনের সুরক্ষার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন, এটি তাঁর কৃপা। কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যাই এর অর্থের সুরক্ষা। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা এযুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন আর তিনি (আ.)-কে গ্রহণ করার তৌফিক দিয়ে এই কাজের জন্য আমাদেরও মনোনীত করেছেন এবং বেছে নিয়েছেন। অতএব এই সুন্দর শিক্ষা পৃথিবীতে বিস্তারের কাজ করা সব আহমদীর দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য সব আহমদী ছেলে-মেয়ে এবং নর-নারীর চেষ্টা করা উচিত। পৃথিবী এখন অগ্নিকুন্ডের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। পরিস্থিতি এমন মোড় নিতে পারে যার ফলে তাদের তাতে পড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে পৃথিবীবাসীকে এই অগ্নিতে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষার চেষ্টা করা আর শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানের কাজ করা একজন আহমদীর দায়িত্ব আর কেবল আহমদীরাই তা করতে পারে।

অতএব এর জন্য চেষ্টার প্রয়োজন। আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা'লার সাথে বিশেষ সম্পর্ক বন্ধন রচনা করা, তাঁর সামনে বিনত হওয়া, তাঁর তাক্বওয়া অবলম্বন করা, হৃদয়ে তাঁর ভীতি এবং ভালোবাসা সৃষ্টি করা; কেবল তবেই আমরা নিজেদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এবং পৃথিবীবাসীকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে পারি। এমনই মুহূর্তের জন্য এমন পরিস্থিতিকে সামনে রেখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کے رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار অর্থাৎ, আগুন সর্বত্র আগুন, কিন্তু এই আগুন থেকে তাদেরকে রক্ষা করা হবে যারা মহা বিস্ময়ের অধিকারী খোদাকে ভালোবাসে।

অতএব আমাদের এই বিস্ময়ের মালিক এবং সর্বশক্তিমান খোদার সাথে সম্পর্ক দৃঢ়তর করার প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই খোদা-প্রেমের জগতে আমাদের আরো উন্নতি করার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন আর দুনিয়ার কীটদেরও বিবেক বুদ্ধি দিন, তারা যেন খোদার ডাকে সাড়া দেয় এবং আত্মসংশোধনের চেষ্টা করে আর ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

নামাযের পর একজনের জানাযা হাযের এবং দু'জনের গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব। জানাযা হাযের হলো জনাব এনায়েতউল্লাহ্ আহমদী সাহেবের যিনি ২০১৫ সনের ৯ই ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون। তিনি জামাতের মুবাল্লিগ ছিলেন, দীর্ঘকাল মুবাল্লিগ

হিসেবে জামাতের খিদমত করেছেন। তার পিতার নাম হলো আল্লাহ্ বক্স সাহেব, যিনি কাদিয়ানের আল্লাহ্ বক্স টিম প্রেসের মালিক ছিলেন। এনায়েতুল্লাহ্ আহমদী সাহেব ১৯২০ সনের জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ৫ বছর বয়সে কাদিয়ানে স্থানান্তরিত হন এবং কাদিয়ানের তালীমুল ইসলাম স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৩৬ সনে কাদিয়ানের তালীমুল ইসলাম স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৩৯ সনে পূর্ব আফ্রিকায় সেনাবাহীনিতে যোগ দেন আর ১৯৪৬ সনে জুলাইয়ে পাশ করেন। ১৯৪৪ সনের ৩০শে মে, ২৪ বছর বয়সে জীবন উৎসর্গ করেন এবং ১৯৪৬ সনের জুলাই থেকে পূর্ব আফ্রিকায় মুবাল্লিগ হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৭৯ সনের ডিসেম্বর মাসে ৬০ বছর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৭৩-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত বহির্বিশ্বে মুবাল্লিগ হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। ৪ বছর ৪মাস কেনিয়াতে, ১৮ বছর ১১ মাস তাঞ্জানিয়ায় মুবাল্লিগ হিসেবে কাজ করেছেন। এরপর অবসর গ্রহণ পর্যন্ত পাকিস্তানের শিয়ালকোট এবং ঝঙ্গ জেলায় মুরুব্বী জেলা হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তার সন্তান-সন্ততিদের মাঝে চার ছেলে এবং তিনজন মেয়ে রয়েছে। এক ছেলে জনাব হাবীবুল্লাহ্ আহমদী সাহেবেরও ওয়াক্ফ হিসেবে কাজের সৌভাগ্য হয়েছে। এনায়েতুল্লাহ্ আহমদী সাহেব যখন তাঞ্জানিয়ায় ছিলেন, সেখানে কাজের গন্ডি প্রসারিত হওয়ার পর ১৯৪৭ সনে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) জনাব মওলানা শেখ মুবারক আহমদ সাহেবকে সাহায্যের জন্য যেসব মুবল্লিগ পাঠিয়েছিলেন তাদের মাঝে চৌধুরী এনায়েতুল্লাহ্ সাহেবও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সেখানে বিভিন্ন স্থানে জামাতের কাজ করেছেন। অনুরূপভাবে শেখ মুবারক সাহেব যখন সোহেলী ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করছিলেন তখনও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তার সাহায্যকারীদের মাঝে চৌধুরী এনায়েতুল্লাহ্ সাহেব এবং মওলানা জালাল উদ্দীন ক্বমর সাহেবকে অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে সোহেলী ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদের কাজ করারও সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি দারুস সালামেও ৩বছর মুবাল্লিগ ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন।

একবার তিনি পাঙ্গালে জামাতের মসজিদে নামায পড়ানোর জন্য সাইকেলে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে আহমদী বন্ধুরা বলে, গয়ের আহমদী ইমাম অন্যান্য লোকদের নিজের দলে ভিড়িয়েছে এবং মসজিদে আগুন দিয়ে মসজিদকে ধুলিস্যাৎ করার পরিকল্পনা রয়েছে, তাই আপনি সেখানে যাবেন না। তিনি তখন বীরত্বের সাথে উত্তর দেন, আমি অবশ্যই যাব এবং তিনি তার যাত্রা অব্যাহত রাখেন। যেমনটি বলেছি, সাইকেলে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে এক জায়গায় পাঙ্গালের চীফ-এর সাথে দেখা হয়। তিনি তাকে সাইকেল যোগে যেতে দেখে ব্রেক করেন এবং বলেন, গাড়ীতে বসুন। তিনি বলেন, আমি সাইকেলে যাচ্ছি এবং ঠিক আছি। যাহোক চীফের অনুরোধে অবশেষে তিনি কারে গাড়ীতে উঠেন আর চীফ তাকে গ্রামে নিয়ে আসে। গ্রামের পরিস্থিতির যে সংবাদ তিনি পেয়েছেন রাস্তায় চীফকে সে সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন চীফ সবাইকে ডাক দেন এবং বলেন, ইনি আমাদের অতিথি আর অতিথির সাথে কেউ দুর্ব্যবহার করবে না। এমনটি আমি হতে দিব না। তার যা সাহায্য করা যায় আমি তা

করবো। ইমামকে তিনি বকা-ঝকা করেন এবং বলেন, আমি তার পিছনে নামায পড়বো। এরপর নামাযের সময় হলে চীফ তার পিছনে তার ইমামতিতে নামায পড়েন। এলাকার লোকদের ওপর তার সুগভীর প্রভাব ছিল এবং তার যোগাযোগের গন্ডিও ছিল ব্যাপক। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার প্রজন্মকে ও সন্তান-সন্ততিকে জামাত এবং খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দিন।

দ্বিতীয়টি হলো গায়েবানা জানাযা, যা কাদিয়ানের দরবেশ মৌলভী বশীর আহমদ সাহেবের জানাযা। ৮৭ বছর বয়সে গত ৭ই ডিসেম্বর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মৌলভী বশীর আহমদ সাহেব বদর সংখ্যায় প্রকাশিত আত্মজীবনীতে লিখেন, এই অধমের গ্রামের এক বন্ধু মোহাম্মদ আহমদ সাহেব কালা আফগানা কাদিয়ান আসেন। আমি ডেরা বাবা নানকে পরীক্ষা দিয়ে চাকুরীর সন্ধানে ছিলাম। জনাব মোহাম্মদ সাহেব পয়গাম পাঠান, আমি টোল আদায় বিভাগে চাকুরী ছেড়ে আল্ ফযল অফিসে কাজ করতে চাই, তুমি আমার জায়গায় টোলে কাজে নিয়োজিত হও, তিনি তখন আহমদী ছিলেন না, এটি ১৯৪৬ সনের কথা। তিনি বলেন, আমি আমার গ্রাম থেকে কাদিয়ান স্থানান্তরিত হই আর টোল আদায় বিভাগে কাজ আরম্ভ করি। এরপর যখন আমি কাদিয়ানে চাকুরীর জন্য আসি তখন আহমদীয়াতের শিক্ষা সম্পর্কে খুব একটা জানা ছিল না। তিনি বলেন, আমি এক অমুসলমান বন্ধুকে বলি, নামাযের জন্য এমন কোন মসজিদের সংবাদ দাও যা কাদিয়ানীদের মসজিদ হবে না, আহমদী মসজিদে আমি যেতে পারি না। সেই অমুসলমান আমাকে মসজিদে আক্বসার রাস্তা সম্পর্কে অবহিত করে। তিনি বলেন, আমি সেখানে গিয়ে দেখি অনেক বড় মসজিদ, কেউ নামায পড়ছে, কেউ তিলাওয়াত করছে, সুন্দর মিনার দেখতে পাই। আমি মনে মনে আনন্দিত হই যে আমাদের মসজিদ তো খুবই ভালো, আমি এখন আর কাদিয়ানীদের মসজিদে যাব না। একদিন জানতে পারলাম, এটি আহমদীদেরই মসজিদ। তিনি বলেন, এরপর একদিন আহরারীদের মসজিদে যাই, সেখানকার অবস্থা দেখে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলাম যে এখন সবসময় মসজিদে আক্বসাতেই নামায পড়বো। এরপর ধীরে ধীরে এক আহমদী বন্ধুর সাথে তার পরিচয় হয়, তিনি তাকে জামাতী বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তবলীগে হিদায়াত ও অন্যান্য বই-পুস্তক পড়তে দেন। তিনি বলেন, এরফলে এই অধম আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে। ১৯৪৭ সনে যখন দেশ বিভাগ হয় তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নির্দেশে খোদ্দামরা দূর-দূরান্ত থেকে কেন্দ্রের হিফাযতের জন্য আসে। তখন এই অধমও কেন্দ্রের সুরক্ষার জন্য নাম লেখায় যা গৃহীত হয় আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা দরবেশদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, বয়আতের পর আমার আত্মীয়-স্বজন বিশেষ করে পিতা-মাতা ভয়াবহ বিরোধিতা করে। এরপর দেশ বিভাগের সময় তারা আমাকে বলে, আমাদের সাথে চলে আস। আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে হাহুতাশ করে কিন্তু আমার অস্বীকারের পর আমার পিতা-মাতা অশ্রু বিসর্জন দিয়ে চেষ্টা করে কিন্তু আমি যাইনি। আমি ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেই বরং তিনি বলেন, আমার এই দুঃখে আমার মায়ের দৃষ্টিশক্তি লোপ পেতে

থাকে। ১৯৫২ সনে হায়দ্রাবাদের জহুর উদ্দীন সাহেবের কন্যা মুক্তারুন নেসা সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয়। তার ঔরশে তার দুই ছেলে, মাহমুদ আহমদ সাহেব এবং শোয়েব আহমদ সাহেব রয়েছেন। শোয়েব সাহেব ওয়াকেফে যিন্দেগী এবং নাযের বায়তুল মাল খরচ হিসেবে কাদিয়ানে কাজ করছেন। তার এক জামাতা ক্বারী নওয়াব সাহেবও ওয়াকেফে যিন্দেগী। তিনিও দেহাতী মুবাল্লিগ হিসেবে মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুমের তবলীগের সুগভীর আগ্রহ ছিল, কোন বোর্ডে বা শ্লেটে লিখে রাখতেন যে, ইমাম মাহদী (আ.) এসে গেছেন যেন মানুষ পড়তে পারে এবং এরপর তবলীগ আরম্ভ করে দিতেন। অনুরূপভাবে তার বিভিন্ন অফিসেও কাজের সৌভাগ্য হয়েছে। বদর পত্রিকার ম্যানেজারও ছিলেন । অতিথিসালা এবং অন্যান্য স্থানেও কাজ করেছেন। বিভিন্ন বিভাগে এবং বিভিন্ন কর্মকর্তার সাথে তার ব্যাপক যোগাযোগ ছিল, তারা তাকে সম্মান করতেন। বার্ধক্য সত্ত্বেও সব সময় মসজিদে এসে জামাতের সাথে নামায পড়তেন। মৃত্যুর দিনও যোহর ও আসর নামায মসজিদে পড়েছেন। মসজিদে মোবারকের পুরনো অংশে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। রূইয়া এবং কুশুফে (সত্য স্বপ্ন ও দিব্যদর্শনের) অভিজ্ঞ এক ব্যক্তি ছিলেন। মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, প্রায় সময় নতুন ওয়াকেফে যিন্দেগী যুবক শ্রেণী তার সাহচর্যে বসে অনেক কল্যাণমণ্ডিত হতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদ মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততিকে তার দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন।

তৃতীয় জানাযা শ্রদ্ধেয়া সৈয়্যদা কানেতা সাহেবার, যিনি উড়িষ্যার অধিবাসীনি। আমাদের ওয়াকেফে যিন্দেগী এবং কাদিয়ানের নূর হাসপাতালের ইনচার্জ ডাক্তার তারেক আহমদ সাহেবের মাতা ছিলেন। তিনি গত ১৬ই অক্টোবর ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون। তিনি স্বল্পেতুষ্ট, সরল প্রকৃতির, ধৈর্যশীলা, দরিদ্রের লালনকারিনী এবং পূণ্যবতী মহিলা ছিলেন। নিজের সন্তান-সন্ততির উচ্চশিক্ষা এবং উত্তম তরবীয়তের প্রতি তার সুগভীর দৃষ্টি ছিল। তার স্বামী সরকারী চাকুরে ছিলেন। সীমিত আয় ছিল কিন্তু তাসত্ত্বেও নিজের দরিদ্র এবং অভাবী আত্মীয়-স্বজনদের খিদমত করতেন বা সেবা করতেন আর এক্ষেত্রে কানেতা সাহেবার সার্বাত্মক সহযোগিতা ছিল। তিনি কখনো আপত্তি করেন নি বরং সব সময় উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, মাগফিরাত করুন এবং তার পুণ্য যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝেও দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সঞ্চালিত হয়। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।